Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 464–470
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

সামাজিক বিবর্তনের ধারায় নাট্য সাহিত্যে কৃষ্ণ চরিত্রের বিনির্মাণ

শুভ দত্ত
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বেথুয়াডহরী কলেজ, বেথুয়াডহরী, নদিয়া
ই-মেইল : duttasubho92@gmail.com

Keyword
নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল, জনা, কারাগার, স্বাধীনতা উত্তর, বাংলা পৌরাণিক নাটক, প্রথম পার্থ

Abstract
সাহিত্যে, যুগ প্রভাব কাহিনির বিনির্মাণে, চারিত্রিক পুনর্গঠনে, শৈলির মাত্রা নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ কৃষ্ণ চরিত্র। কালের গণ্ডি অতিক্রম করে যিনি জাতীয় চরিত্রে পর্যবসিত হয়েছেন। ভারতীয় সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণ চরিত্র অবলম্বনে রচিত হয়েছে সহস্রাধিক সাহিত্য। যার কোনোটি ভক্তির প্রগাঢ়তায় অমলিন, কোনোটি মানবিক আবেদন রসে সিক্ত, কোনোটি শ্রীকৃষ্ণের অপার ঐশ্বর্য্যের দ্যুতি, আবার কোনোটিতে ঘোষিত হয়েছে সামাজিক বিনির্মাণ তত্ত্ব। সতত পরিবর্তনশীল সমাজের স্বরূপ নির্ধারণের পথটি কিন্তু খুব মসৃণ নয়। ধর্মীয় গোঁড়ামি, ধর্ম ধ্বজাধারীর চোখ রাঙানি, রাজনীতির মেকি অনুশাসন, বারবার বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রয়োজন হয়েছে এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মকে ধারণ করেন। রাজনৈতিক আবর্তের কেন্দ্রে বিরাজ করেও রাজনীতির তপ্ত শলাকা যাকে ছুঁতে পারে না। যাকে সামনে রেখে অনায়াসে মুখোশধারীর মুখোশ খোলা যায়। নতুনের জয়গাথা গাঁথতে যিনি চিরনতুন। তাই কালে কালে কৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন সাহিত্যের বাহক। বিশেষত বাংলা নাট্য সাহিত্যে। ভক্ত প্রাণ বাঙালির ভক্তি রসের আকর তিনি, ব্রিটিশ পদানত ভারতের বুকে তিনি বিদ্রোহের মশাল বাহক, জাতীয় চেতনা সঞ্চার তাঁকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত, আবার স্বাধীন দেশের তিনি সফল রাজনীতিবিদ।

Discussion
'প্রভাব' শব্দের প্রয়োগ সার্থকতা নিয়ে সাহিত্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বস্তুত কোন সাহিত্যই প্রভাব বর্জিত নয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো না কোনোভাবে সাহিত্য মাত্রই প্রভাবান্বিত। ভাবকল্প, বস্তুধর্ম, চারিত্রিক সমুন্নতি, শৈল্পিক উৎকর্ষতা, অথবা সামাজিক বিনির্মাণ শিল্প সত্যকে নাড়া দিয়েছে বারেবারে। কিন্তু ব্যক্তিভেদে, শিল্পভেদে তারতম্য বিশেষ। যা শিল্পীর শিল্প সত্তার মান নির্ণায়ক অনেক ক্ষেত্রেই। রামায়ণ চারিত্রিক সমুন্নতির কাব্য। ভ্রাতৃপ্রেম, পত্নীপ্রেম, প্রজাপ্রেমের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ নৈতিকতার জয়গান; মধ্যযুগের সামাজিক আদর্শের দ্যোতক। আর বাংলার উষ্ণ আদ্র অলস জলবায়ু বহন করেছে কোমলতা। সে দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ প্রভাবিত মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' চারিত্রিক সমুন্নতির বিপর্যয়কেই নাম দিয়েছে বিদ্রোহ। লক্ষণ হয়েছে তস্কর, রাম ভীরু, রাবণ দোষ স্খালন করে আপামর সন্তানহারা

পিতার করুন হৃদয়ের আর্তি বহন করে নায়কত্বে উন্নীত হয়েছে। উপাদানের স্বরূপ সন্ধানে 'রামায়ণে'র প্রভাবের খোঁজ মিললেও, কাহিনির বিনির্মাণকে তবে কি নাম দেওয়া যায়? অভিব্যক্তি? এ নিয়ে তর্ক চলতেই পারে। তবে এ বিষয়ে একমত হওয়া যায় যে, যুগ প্রভাব কাহিনির বিনির্মাণে, চারিত্রিক পুনর্গঠনে, শৈলির মাত্রা নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ কৃষ্ণ চরিত্র। কালের গণ্ডি অতিক্রম করে যিনি জাতীয় চরিত্রে পর্যবসিত হয়েছেন।

ভারতীয় সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণ চরিত্র অবলম্বনে রচিত হয়েছে সহস্রাধিক সাহিত্য। যার কোনোটি ভক্তির প্রগাঢ়তায় অমলিন, কোনোটি মানবিক আবেদন রসে সিক্ত, কোনোটি শ্রীকৃষ্ণের অপার ঐশ্বর্য্যের দ্যুতি, আবার কোনোটিতে ঘোষিত হয়েছে সামাজিক বিনির্মাণ তত্ত্ব। সতত পরিবর্তনশীল সমাজের স্বরূপ নির্ধারণের পথটি কিন্তু খুব মসৃণ নয়। ধর্মীয় গোঁড়ামি, ধর্ম ধ্বজাধারীর চোখ রাঙানি, রাজনীতির মেকি অনুশাসন, বারবার বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রয়োজন হয়েছে এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মকে ধারণ করেন। রাজনৈতিক আবর্তের কেন্দ্রে বিরাজ করেও রাজনীতির তপ্ত শলাকা যাকে ছুঁতে পারে না। যাকে সামনে রেখে অনায়াসে মুখোশধারীর মুখোশ খোলা যায়। নতুনের জয়গাথা গাঁথতে যিনি চিরনতুন। সেই কৃষ্ণ।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের বিষয়বস্তু নাট্য সাহিত্যে কৃষ্ণ চরিত্রের বিবর্তন। বাংলা নাট্য সাহিত্যে গিরিশ পূর্বে যেসব নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে তাতে পরিপূর্ণ ভক্তিরসের সন্ধান পাওয়া যায়না। পেশাদার নাট্যকার গিরিশ ঘোষ প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন কৃষ্ণ যাত্রার রসে পুষ্ট বাঙালি, নাটকের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি আস্বাদন করতে চায়। সে কারণে 'বৃষকেতু' 'চৈতন্যলীলা' 'নিমাই সন্ন্যাস' 'রূপ সনাতন' 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' এবং 'জনা' নাটকে কৃষ্ণভক্তির প্লাবন এনে দিলেন। এই সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিজেই 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে লিখেছেন -

> "ভারতবর্ষের জাতীয়তার মর্মে ধর্ম। দেশ হিতৈষণা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে তা হতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভারত ধর্মপ্রাণ, যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হাল সঞ্চালন করিতেছে তাহারা কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট। যদি নাটকের সার্বজনীন হওয়া প্রয়োজন হয় তবে কৃষ্ণ নামেই হইবে। হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিত হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।"[১]

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'জনা' (১৮৯৩ খ্রি) শ্রেষ্ঠ। প্রবীর কাহিনি, জনা কাহিনি, কৃষ্ণ কাহিনি- এই তিন কাহিনি 'জনা' কাহিনি নির্মাণে সহায়তা করলেও, সমগ্র নাটক আবর্তিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমময় রূপের ঐশ্বর্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে। দিব্যদৃষ্টিতে প্রবীরের সাথে অর্জুনের অনিবার্য যুদ্ধ দেখে হস্তিনাপুরে কৃষ্ণের আগমন, প্রবীর হত্যার সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ণ, মায়া বলে যজ্ঞের অশ্ব লুকিয়ে রাখা, কামাচারে লিপ্ত করে প্রবীরের শক্তি নাশ, জাহ্নবীর অংশে জন্ম জনার তেজ অশত্থ বৃক্ষ রূপে ধারণ, অর্জুনকে একচ্ছত্র অধিপতি করা, সবকিছুর মধ্যেই কৃষ্ণের অলৌকিক মহিমময় রুপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মিল, বেন্থামের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনকিছুই বিনা যুক্তিতে মেনে নিতে চায়নি। গিরিশের কৃষ্ণ ভক্তি বিহ্বলতার একটা যুক্তি এক্ষেত্রে অবশ্য খাড়া করা যেতে পারে- তা হল নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক প্রকাশ!

পৌরাণিক নাটক মাত্রই ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। গিরিশ ঘোষ অবশ্য দৈব চরিত্রের মানব মুখী আচরণকে ধীরে ধীরে তুলে ধরেছেন নাটকে। অগ্নিদেব মানবিক সম্পর্কে বাঁধা পড়েছেন নীলধ্বজের জামাতা রূপে। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। তাই মাতৃভক্ত প্রবীরকে তিনি ভয় পান। তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে মঙ্গলকাব্যের মতোই ছলচাতুরীর আশ্রয় নেন। মঙ্গলকাব্যের মতোই কৈলাসে গিয়ে দেবাদিদেবের কৃপা ভিক্ষা করেন।

> শ্রীকৃষ্ণ।। "শিব বলে বলি বীর প্রবীর কুমার,
> শিব পূজা বিনা কার্য না হবে উদ্ধার।
> ধ্যানযোগে চলো যাই কৈলাস-আলয়

চলো কুঞ্জবনে নিভৃতে বসে গে ধ্যানে।"[২]

মহাদেবের কৃপায়, কৃষ্ণের চাতুরীতে, প্রবীর বিনাশ কার্য সম্পন্ন করেছেন অর্জুন। কিন্তু জনা ভীতি কৃষ্ণকে রেহাই দেয়নি। বারবার বৃষকেতুকে অন্বেষণ করিয়েছেন ভৈরবরূপিনী রমনী অক্ষহীনি মাঝে আছে কি না জানতে। অবশেষে জনার বিভীষণা মূর্তি দেখে তাঁকে পালাতে হয়েছে। জাহ্নবী সন্তান জনার রোষ একা গ্রহণে অসমর্থ কৃষ্ণ। তার তিনভাগের একভাগ মাত্র গ্রহণ করতে পেরেছেন অশ্বত্থ তরু বেশে।

শ্রীকৃষ্ণ।। "তিন অংশ হয় যদি এই ক্রোধানল
কষ্টের সাধ্যে হয় তার পার্থের উদ্ধার।
এক অংশ লইবারে পারি,
অধিক শকতি নাহি মম"[৩]

'জনা' নাটকে কৃষ্ণ চরিত্রের স্বরূপ সবচেয়ে বেশি উন্মোচিত হয়েছে বিদূষক এর মাধ্যমে। আপাতদৃষ্টিতে তাকে মন্ডা লোভী বামন হিসেবে দেখা গেলেও, সেই প্রকৃতপক্ষে মহিষ্মতীপুরের শুভ চিন্তক। তিনি জানেন কৃষ্ণভক্তির সাথে ঐহিরক সুখের নিত্য বৈরিতা। ঐহিক সুখ লাভ করতে হলে কৃষ্ণভক্তি ত্যাগ করতে হবে। পারোলৌকিক পথের কান্ডারী তিনি।

বিদূষক।। "কৃষ্ণ দয়াময়, নাম
কল্লেই হন উদয় - কিন্তু যেখানে
দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্ব্বনাশ
হয়, একথা নিশ্চয়।"[৪]

এই 'সর্ব্বনাশ', ইহ জগত থেকে মুক্তির নামান্তর। জগত ও জীবন থেকে যার মন ভরেছে সেই কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা হয়েছে। বিদূষকের রাজ্যপাটে এখনো মন ভরে নি। মণ্ডা মিঠায়ে বেশ আছেন তিনি। তাই কৃষ্ণ নামে তার ইচ্ছা নেই। রাজা নীলধ্বজ বিপদে কাণ্ডারী শ্রীহরিকে স্মরণ করলে, বিদূষক সাবধান করে বলেছেন-"অমন কাজ করবেন না মহারাজ।"[৫]

বিদূষক।। "যদি ঐহিক সুখ চাও ত হরিনাম
যেথা হয় কানে আঙ্গুল দাও;
আর যদি সকাল সকাল বৈকুণ্ঠ
শুভাগমন বাসনা থাকে, বৈকুণ্ঠনাথের
শ্রীচরণ হৃদয় ধরে বনবাসে যাও।"[৬]

মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো 'কারাগার' (১৯৩০)। পৌরাণিক কাহিনির প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক সংগ্রামের এমন এক অগ্নিময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন যা দীর্ঘকাল ধরে মুক্তিকামী জনগণের মনে প্রবল উদ্দীপনা জাগিয়ে এসেছে। নাট্যকার 'কারাগার' বিষয়ে বলেছেন-

> "দেশে তখন রাজ শক্তির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল। মহাত্মাজীর নির্দেশও ছিল তাই। এই পটভূমিকায় মহাভারতে বর্ণিত কংস কারাগারের কথা আমার মনে এসেছিল। যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম হয়েছিল, সেই কারাগারেই আজও উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা সূর্য। চল সব সেই মহাতীর্থে- এই ভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল আমার এই কারাগার নাটক।"[৭]

প্রসঙ্গত এই নাটকে শ্রীকৃষ্ণর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। নেই কেননা লেখকের কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণ কোন ব্যক্তি নন। তিনি আইডিয়া। যে আইডিয়া সার্থকতা পায় সংঘবদ্ধতায়। নাটকে কংস ভারতবর্ষের ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিভূ। ভারতবাসীর

অর্থগৃধ্নতা তার বল, ভারতবাসীর পদলেহন তার সম্মান। ভারতবাসীর প্রশ্নহীন আনুগত্য যে শক্তিকে দিয়েছিল শোষণের অধিকার।

বসুদেব।। "তোমরাই আজ কংসের সৈন্য তোমরাই তার গুপ্তচর, অনুচর, সহায়-সম্পদ।"[৮]
প্রথম যাদব।। "কিন্তু এত করেও তো প্রভুর মন পেলাম না। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।"[৯]
বসুদেব।। "যেহেতু অত্যাচার সইবার ক্ষমতাও তোমাদের বেড়ে চলেছে।"[১০]

১৯৩৯ সালে রচিত এই সংলাপ যতনা বেশি মহাভারতীয় অনুষঙ্গ দ্যোতিত করে, তার থেকে বেশি ব্রিটিশ পদানত ভারতবর্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রথম যাদব।। "যাদব হয়েও তারা যাদবপুরের আরাধ্য দেবতা নারায়ন বিগ্রহ ধ্বংস করল!"[১১]

বস্তুত কোন জননেতাই জনগণ ছাড়া সম্পূর্ন নয়। নেতার আইডিয়া পারে জনগণকে সম্মিলিত করতে। কৃষ্ণ সেই আইডিয়া। যাকে আশ্রয় করে দলে দলে লোক একত্রিত হয়। তার বিগ্রহ ধ্বংস, মানে জনবলহীন ভারতবর্ষ। নাট্যকার তাই শ্রীকৃষ্ণের সূতিকাগৃহে নাটকের পটভূমি নির্মাণ করেন। যে সূতিকাগৃহ গান্ধীজী সকলকে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যেখান থেকে আইডিয়া সঞ্চারিত হয়ে প্রত্যেক ভারতবাসী হয়ে উঠবে এক এক জন শ্রীকৃষ্ণ। যে কৃষ্ণ অস্ত্র না ধরেও পাল্টে দিতে পারে রাজশক্তির ইতিহাস। গান্ধীজীর আন্দোলন তাই অহিংস আন্দোলন।

কাঞ্চন।। "ভগবান জাগে - ভগবান জাগে। অত্যাচারের আগুন যখন জ্বলে ওঠে, তখন মৃত মানব জাগে, নির্ধারিত ভগবান জাগে।"[১২]

মৃত মানব জাগার প্রসঙ্গটিতে আছে নতুনত্ব। শাসকের বিরোধিতা করে যারা শহীদ হন, অমর লোকের অমৃত থেকে তারা বঞ্চিত হন না। এই ভারতবর্ষে চিরকাল সেই অমর লোকের যাত্রীদের স্মরণ করে এসেছে। নিবেদন করেছে শ্রদ্ধার্ঘ্য। যারা মানুষের কাজ করে, মানুষের জন্য সুখবিলাস ত্যাগ করে, নিজের জীবন উৎসর্গ করে, তাদের মাঝে খোঁজ মেলে নিদ্রিত ভগবানের। কিন্তু সে ভগবানের নিদ্রা এত ঠুনকো নয়। শতাব্দী লেগে যায় তার নিদ্রা ভাঙতে। কংস সেই নিদ্রা ভেঙেছিল-

কংস।। "আমি তাই অত্যাচারে অত্যাচারের তাকে জর্জরিত করে স্বর্গ থেকে আমার এই মর্তেই টেনে এনেছি। কেন জান?"[১৩]

নাট্যকার জানিয়েছেন তার কারণ। কিন্তু পাঠক মাত্রই অনুধাবন করে থাকবেন ফুল নৈবেদ্য সাজিয়ে যে দেবতার তপস্যা করা হয় এ সে নয়। এই দেবতা গন দেবতা। শোষণের জোয়াল কাঁধে নিয়ে যারা শতাব্দী পার করে দেয় হাসিমুখে। অথচ যখন জাগে ব্রিটিশ সরকারের সিংহাসন আর অটুট থাকে না।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা পৌরাণিক নাটকে দেখা যায় মন্দার কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ, মন্বন্তর, অনাহার, মৃত্যু, নকশাল আন্দোলন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীক জীবনে নিয়ে এসেছিল অনিশ্চয়তা। এই একই অবস্থা আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যে লক্ষ্য করি। আদি মধ্যযুগের মানুষ ছিল দেবতার হাতের পুতুল মাত্র। দেবতার ছত্রছায়ায় মানুষের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিলনা। মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত হতো দেবতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রভাবে। কিন্তু অন্ত্য মধ্যযুগের শেষের দিকে বর্গী হানা, রাজস্ব কর বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। বেঁচে থাকা যেখানে দায় হয়ে পড়ে সেখানে দৈব কল্পনাতেও ভাঁটা পড়ে। ভারতচন্দ্রে কাব্য সেই যুগের ফসল।

মন্মথ রায়ের 'কারাগার' যে নতুন ধরনের পৌরাণিক নাটক রচনায় দিশা দেখিয়েছিল, তা স্বাধীনতা-উত্তরকালে পুরাণ নির্ভর নাটক রচনায় পাথেয় হয়ে উঠল। পুরাণ চরিত্রের ক্রাইসিসের সাথে আধুনিককালের মানুষের জীবনের সমস্যাকে ওতপ্রোত করে দেখবার চেষ্টা তাই অতি সাম্প্রতিককালের নাট্যকারদের মধ্যে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম পার্থ' এই সমস্যার জীবন্ত দলিল।

প্রথম পার্থ রচনাকাল ১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। 'মহাভারতে'র কর্ণ বধ এর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগের দিনের ঘটনা নিয়ে। এই নাটকে কৃষ্ণ সরাসরি মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন ঐশ্বরিক শক্তিতে মহিমান্বিত হয়ে। কিন্তু তার প্রকাশ নাটকে দেখিনা। কর্ণের সংলাপে তা ব্যক্ত হয়েছে। কৃষ্ণচরিত্রকে বুদ্ধদেব বসু আপন মহিমায় প্রাঞ্জল করে তুলেছেন আলোচ্য নাটকে। মৃদু, তীক্ষ্ণ, অপ্রিয়, প্রিয়, কোপান্বিত, ছিদ্রান্বিত, ছলনাময়, অম্ল, মধুর, উদ্দেশ্যপ্রসূত, ভাবিগর্ভ বাক্যে পটু কৃষ্ণ যথার্থ কূটনীতিবিদ হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন।

ইতিমধ্যে কুন্তী ও দ্রৌপদী আসন্ন যুদ্ধ থেকে কর্ণকে বিরত করতে মাতৃসত্তা ও প্রেমিক সত্তার পূর্ণ ব্যবহার করে গেছেন। কৃষ্ণ জানতেন কর্ণ বিচলিত হওয়ার পাত্র নন। তবুও স্নেহ, প্রীতি মানুষকে দুর্বল করে তোলে একথাও তাঁর মত বিচক্ষণের অজ্ঞাত নয়। তাই কর্ণকে যাচাই করে নেয়-

কৃষ্ণ।। "আমি বলেছিলাম, কর্ণকে
আমি যতদূর জানি, কেউ কখনও পারবে না
তাঁর স্বীয় সংকল্প থেকে একচুল টলাতে,
একতিল হেলাতে,"[১৪]

কর্ণ।। "কিন্তু আমি -
আমি ফিরে পেয়েছিলাম তারুণ্য-তাঁদের দেখে
যেন বালক-নবযুবক-মাতৃস্নেহলিপ্সু,
নারীর সঙ্গ কামনায় চঞ্চল"[১৫]

কৃষ্ণ।। "তবু -
তোমার বিচার বুদ্ধি স্থির ছিল নিশ্চয়ই?"[১৬]

'তবুও-তোমার বিচার বুদ্ধি স্থির ছিল নিশ্চয়ই?' কৃষ্ণের এ প্রশ্ন নয়। এ সংশয়! এই সংশয় ঘনীভূত যুগ মানসের সংশয়। ১৯৭০ সালের সংশয়ান্বিত বাঙালির মজ্জাগত সংস্কার। কোন কিছুই স্থির নয়। না জীবন, না জীবিকা, না সম্মান, না রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত। মতাদর্শগত বিরোধে বাঙালির অস্তিত্বে দেখা গেছে চরম সংকট। কৃষ্ণচরিত্রেও এই সংশয় প্রবল আকার নিয়েছে। কারণ নিয়তি নির্ধারক কৃষ্ণ জানেন, সূর্যোদয়ের সাথে সাথে যুদ্ধ শুরু। সেখানে কর্ণকে এই প্রশ্ন করা অবান্তর। অথবা দ্রৌপদি-কুন্তী কর্ণকে সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারবে না জেনেও, কর্ণকে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে একবার যাচাই করে নেওয়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে অবিশ্বাসের বিষবাষ্প।

এই অবিশ্বাস যেমন পরস্পরজাত, তেমনি মনোগত। স্বাধীনতা-উত্তর দীর্ঘ ২২ বছর বাঙালি বেঁচেছে কেবল অবিশ্বাসকে পাথেয় করে। ভাই-ভাই এ অবিশ্বাস। নেতাদের প্রতিশ্রুতি অবিশ্বাস। ধর্মে অবিশ্বাস। রুটি-রুজি-রোজগারে অবিশ্বাস। অবিশ্বাস যেন একটা স্বতন্ত্র চরিত্র নিয়ে বিরাজ করেছে যুগমানসে। যাকে অস্বীকার করতে পারেনি সমকালের লেখকবৃন্দ। তাই কর্ণ যখন বলে -

কর্ণ।। "হয়তো আমিও সুখী হতে পারতাম-
অন্য কোথাও - যুদ্ধ থেকে, রাজনীতি থেকে দূরে।"[১৭]

অথবা

কর্ণ।। "এখনো একটি রাত্রি আছে আমার।"[১৮]

বস্তুতই আজন্ম লালিত বাঙালির স্বপ্ন এই কর্ণ। একটু সুখের প্রত্যাশী সে। মায়ের স্নেহ, প্রিয়ার উষ্ণ আদর লালায়িত। তাই কৃষ্ণকে সাবধান করতে হয়-

কৃষ্ণ।। "ক্ষত্রোচিত নয়
যুদ্ধের পূর্বক্ষণে এই স্মৃতি বিলাস।"[১৯]

কর্ণ তা জানে। জানে নকশাল আন্দোলনে শরিক বাংলার প্রতিটি যুবক। এই স্নেহ, উষ্ণতা, সুখ স্বপ্ন, মায়ের চিন্তা, সবকিছু পায়ে দলে এগিয়ে যেতে হয় আশু কর্তব্যকে সফল করতে।

কর্ণ।। "আমি চাইনা উদ্ভিদের মত জীবন।
আমার সার্থকতা চেষ্টায় – সংগ্রামে।"[২০]

কৃষ্ণ জানেন পরবর্তী জীবন তাঁর রাখাল জীবন। শান্তির জীবন। সুরের মূর্ছনায় ভেসে যাওয়া জীবন। যে জীবন ইতিমধ্যে বেছে নিয়েছেন বলরাম। যে জীবন বাছতে চলেছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। অথচ তাঁকেই বলতে হয় -

কৃষ্ণ।। "বলরামের দৃষ্টান্ত
অন্যদের অনুকরণযোগ্য নয়।"[২১]

অনুকরণীয় নয় কারণ বেয়নেটের সামনে ফুলের তোড়া টেকেনা। অধিকার আদায়ে বেছে নিতে হয় বেয়নেট। যে বেয়নেট সীমাবদ্ধ শাসকশ্রেণীর অস্ত্র। যার তীক্ষ্ণ ফলা দেখেনা বৃদ্ধ, নারী, শিশু, শস্য-শ্যামলা পৃথিবী। যার একমাত্র লক্ষ্য তড়িৎ জয়।

কৃষ্ণ।। "সবচেয়ে ভীষণ সেই যুদ্ধ, যেখানে দুপক্ষেরই শক্তি প্রায় সমান
যেমন পাণ্ডবেরা আর কর্ণ সমেত কৌরব।"[২২]

কর্ণ পাণ্ডব পক্ষ নিলে, শক্তিহীন কৌরব আর যুদ্ধ যাবেনা। কৃষ্ণ সেই সন্ধিতে বিশ্বাসী। তাতে শান্তি ত্বরান্বিত হবে। নতুবা কর্ণকে ভুলিয়ে দেবে পরশুরামের দেওয়া অস্ত্রের নাম। ডুবিয়ে দেবে তার রথের চাকা। অথবা মৃদু হাতে খসিয়ে দেবে যুদ্ধের গ্রন্থি। কারণ -

কৃষ্ণ।। "সব যুদ্ধই অন্যায়।
সব হত্যাই ভাতৃহত্যা।"[২৩]

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, পৌরাণিক নাটক, রঙ্গালয় পত্রিকা, রচনা ৩০ চৈত্র, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ
http: //www.theatrewala.net/shankha/28-2014-12-13-08-52-47/205-2015-01-21-18-35
২. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, জনা, সম্পাদনা ড. মনিলাল খান, প্রজ্ঞা বিকাশ, জানুয়ারি, বইমেলা, ২০১৯, পৃ. ১১
৩. তদেব, পৃ. ৪২
৪. তদেব, পৃ. ৬
৫. তদেব, পৃ. ১৪
৬. তদেব, পৃ ১৫
৭. রায়, মন্মথ, কারাগার, সম্পাদনা ড. সনাতন গোস্বামী, প্রজ্ঞা বিকাশ, জানুয়ারি, ২০২০ প্রস্তাবনা, পৃ. ২
৮. তদেব, পৃ. ১
৯. তদেব, পৃ. ১
১০. তদেব, পৃ. ১
১১. তদেব, পৃ. ১
১২. তদেব, পৃ. ৪৫
১৩. তদেব, পৃ. ৬৪
১৪. বসু, বুদ্ধদেব, অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ, দুটি কাব্যনাট্য, দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৬০, পৃ. ১৩৭
১৫. তদেব, পৃ. ১৩৯
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৯
১৭. তদেব, পৃ. ১৪১

১৮. তদেব, পৃ. ১৪০
১৯. তদেব, পৃ. ১৪০
২০. তদেব, পৃ. ১৪১
২১. তদেব, পৃ. ১৪২
২২. তদেব, পৃ. ১৪৪
২৩. তদেব, পৃ. ১৫২

গ্রন্থপঞ্জি :

১. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, জনা, সম্পাদনা ড. মনিলাল খান, প্রজ্ঞা বিকাশ, জানুয়ারি, বইমেলা, ২০১৯
২. রায়, মন্মথ, কারাগার, সম্পাদনা ড. সনাতন গোস্বামী, প্রজ্ঞা বিকাশ, জানুয়ারি, ২০২০
৩. বসু, বুদ্ধদেব, অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ, দুটি কাব্যনাট্য, দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৬০
৪. চট্টোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, বাংলা পৌরাণিক নাটক, গ্রন্থ বিকাশ জুলাই ২০০৯
৫. চৌধুরী, দর্শন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, সেপ্টেম্বর ২০১১
৬. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার সমরেশ (সম্পাদিত), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, প্রথমখণ্ড, বাংলা পৌরাণিক নাটক, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ১০ই জুলাই ২০১৩